শিকার

©

বারোমাসি প্রকাশনী

শিকার

সরওয়ার পাঠান

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

শিকার

সরওয়ার পাঠান

গ্রন্থস্বত্ব©নাদিয়া খানম

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
শাবান, ১৪৪৬

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

SHIKAR

SARWAR PATHAN

Copyright @Nadia Khanom

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
বারোমাসি

মুদ্রাক্ষরিক : বারোমাসি

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : চারশত টাকা মাত্র **US : $5**

ISBN: 978-984-99551-1-5

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

ধ্রুব এষ—
খ্যাতিমান প্রচ্ছদশিল্পী,
আসলে এক বিরাট শিশু।

সূচি

নিঝুম অরণ্যে/ ০৯
শিকারী/ ১৪
রাজবাড়ির পাহারাদার/ ১৯
এফরান ও মেছোবাঘ/ ২৯
এলসা আমার এলসা/ ৩২
ভয়ালদৃষ্টি/ ৪৮
শিশুলোভী পিশাচ/ ৬১
ফাইটার/ ৬৯
শুশুকের প্রতিহিংসা/ ৭২
শশক/ ৮৭

নিঝুম অরণ্যে

সবেমাত্র এইচ এস সি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। জাহিদের হাতে এখন অফুরন্ত অবসর। সে সময় তার কয়েকজন বন্ধু প্রস্তাব করল, ওরা গভীর জঙ্গলে রাত কাটাতে চায়। জাহিদ প্রথমে ওদের প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলো না। সে ওদের বোঝাল। রাতের বেলা জঙ্গলের রূপ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। নানা রকম বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে চারদিকে। সবচেয়ে বড় কথা কয়েকদিন আগে শিকারে গেলে ওর রাইফেলের স্ট্রাইকিং পিন ভেঙে যায়, ওটাকে মেরামতের জন্য ঢাকার *আহমদ আমস স্টোর*-এ দিয়ে এসেছে। রাইফেল পাবে দু' সপ্তাহ পর। রাইফেল ছাড়া এতোগুলো লোককে নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া মূর্খতার শামিল। কিন্তু তার বন্ধুরা কিছুতেই ওর কথা শুনল না। ওদের বক্তব্য, শিকার কিংবা প্রাণীহত্যা নয়; তারা শুধু গহীন বনের রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ইচ্ছুক। ওরা ভালো করেই জানে, ভাওয়ালের প্রায় সব জঙ্গলের অবস্থান জাহিদের নখদর্পণে। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাইফেল থাক আর না থাক, জাহিদ সাথে থাকলে ওদের কোন ভয় নেই। জাহিদের উপর ওদের আস্থা মোটেই অমূলক নয়।

জাহিদদের পরিবার শিকারী পরিবার। দুর্দান্ত সব শিকারীর রক্ত বইছে ওর ধমনীতে। পরদাদা শিকার করতেন তীর-ধনুক দিয়ে। দাদা শিকারে যেতেন গাদা বন্দুক নিয়ে। বাবা শিকার করেন শটগান দিয়ে। জাহিদের নিত্য সঙ্গী ইংল্যান্ডের .২২ বোরের রাইফেল। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বাবা ওকে এটা কিনে দিয়েছিলেন। সেই থেকে জঙ্গলের অন্দর মহলে নিয়মিত যাতায়াত ওর। জাহিদের শিকারের নেশা, বুনো স্বভাব ও দুর্দান্ত সাহসের কথা শুধু তার বন্ধু-বান্ধব নয়, এলাকার সবাই ভালো করে জানে। জাহিদেরও এসব জানা আছে। কিন্তু সে কখনোই ভাবেনি, বন্ধুরা তাকে এতোটা বিশ্বাস করে। তাই বন্ধুদের অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে অবশেষে ওকে রাজি হতে হলো। আর স্বভাবতই তখন দলনেতার দায়িত্ব পড়ল ওর কাঁধে।

এরপর থেকে ওরা জঙ্গলে রাত কাটানোর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গলের ভিতরে রাত্রি যাপনের জন্য ওদের কিছু জিনিস অবশ্যই দরকার। থাকা-খাওয়া, রান্না, প্রয়োজনীয় আলো ইত্যাদির জন্য একে একে সরঞ্জাম সংগ্রহ শুরু হলো। বেশ কয়েকদিন ধরেই চলল ওদের প্রস্তুতি পর্ব। ইতোমধ্যে ওরা প্রয়োজনীয় সব জিনিস ভাগ করে যার যার ব্যাগে ভরে রাখল। এসব জিনিসের মধ্যে ছিল চাল, ডাল, মসলা, দু'টো হ্যারিকেন, তাঁবু তৈরির মোটা পলিথিন, দু'টো টর্চ লাইট, একটা ওয়ান ব্যান্ডের রেডিও। কেটলি, চা পাতা-দুধ-চিনি, বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি। এসব ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ছোটখাটো সরঞ্জাম ওরা ব্যাগে ভরে নিল।

অবশেষে, ওদের নির্ধারিত যাবার দিন এসে গেল। সকালের নাস্তা সেরে যার যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে জঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ঘন্টা খানেক এগিয়ে যাওয়ার

পর, ছোট্ট একটি নদী পার হয়ে লাল মাটির উঁচু-নিচু রাস্তা হাঁটতে শুরু করল। ওদের প্রত্যেকে কাঁধে ভারী ব্যাগ থাকায় সবারই পৌঁছাতে কষ্ট হচ্ছিলো। প্রায় চার ঘন্টা হাঁটার পর, ওরা নির্ধারিত গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেল। জাহিদ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, জঙ্গলের সবচেয়ে কাছাকাছি যে বাড়িটি আছে, প্রথম সেখানে যাবে এবং বাড়ির লোকজনদেরকে তাদের পরিকল্পনার কথা খুলে বলবে।

জঙ্গলের কাছে পৌঁছে, এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার সময়, বনের ধারে টিলার মাথায় সুন্দর একটি বাড়ি দেখতে পেল। সবাই জাহিদের সঙ্গে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। বাড়ির মালিকের নাম জয়নাল মিয়া। কথাবার্তায় বুঝা গেল ওরা অতিথিপরায়ণ মানুষ। জাহিদ তাদের নিজেদের পরিকল্পনার কথা খুলে বলতেই তারা ওদের জঙ্গলে রাত্রি যাপন করতে বারণ করল। জাহিদ বুঝতে পারল না এত ভয়ের কী আছে? এদিকের জঙ্গলে কোনো ধরনের হিংস্র জন্তু নেই, তা ভেবেই সে বন্ধুদের এখানে নিয়ে এসেছে। জঙ্গলের আরেক আতঙ্ক হচ্ছে বনদস্যু ডাকাত, কিন্তু ওদের সঙ্গে এমন কোনো মূল্যবান জিনিস নেই যার জন্য ডাকাতরা ওদের আক্রমণ করবে। জাহিদের এসব যুক্তি আর অন্যদের চাপাচাপিতে অবশেষে বাড়ির লোকজন বনের জঙ্গলে রাত কাটানোর সব রকম ব্যবস্থা করতে রাজী হলো। শুধু তাই নয়, জয়নাল মিয়ার ছেলে জাকিরও ওদের সঙ্গে জঙ্গলে রাত কাটাতে চাইল, ওরা খুশি মনে রাজী হয়ে গেল।

বিকেলে জয়নাল মিয়ার বাড়ি থেকে তাঁবুর খুঁটি, কোদাল আর একটা বল্লাম ও অন্যান্য আরো কিছু জিনিস নিয়ে ওরা জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে ওরা রাত কাটানোর জন্য সুন্দর একটি জায়গা খুঁজে বের করল। জায়গাটার তিন দিকে বন, এক দিকে বিল, বিলের পার জুড়ে ছোট-সবুজ মাঠ। সেখানে পৌঁছে ওরা যার যার ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে কাজ শুরু করল। প্রথমে সবাই মিলে খুঁটি পুঁতে সুন্দর একটি তাঁবু তৈরি করে ফেলল। বন্ধুদের মধ্যে রিপন মাটি খুঁড়ে সুন্দর একটা চুলা তৈরি করল, তাতে কেটলী বসিয়ে চা বানাতে লাগল একজন। ইতোমধ্যে আরেকটা চুলা তৈরি করা হলো। রাতের খাবারের জন্যে ওদের সঙ্গে করে আনা মুরগী দু'টো জবাই করা হলো। কয়েকজন রান্নার জন্য চাল-ডাল ধুয়ে আনতে গেল। কেউ কেউ পেঁয়াজ-রসুন-মসলা ঠিক করতে লাগল। জাহিদ হ্যারিকেনদ্বয় জ্বালিয়ে একটি তাঁবুর মাঝামাঝি খুঁটিতে ঝুলালো আর অন্যটি তাঁবুর অদূরে রাখল। ওদের সবার মানে এখন বিরাজ করছে অরণ্যে নিশি যাপনের চাপা আনন্দ। সমাজ-সভ্যতাকে ত্যাগ করে চলে এসেছে একেবারে নির্জন আদিম এক বুনো জীবনে। অজানা এক শিহরণে দুরুদুরু করছে সবার মন। ইতোমধ্যে চা হয়ে গেল। গরম চা মুখে দিতেই পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল দেহ-মন। মনে হলো এমন স্বাদের চা জীবনে কোনদিন পান করেনি ওরা। চা পানের পর দু'টো চুলোতেই রাতের রান্নার আয়োজন

শিকারী

সুলতানপুর গ্রামের মানুষের কাছে সুঠামদেহী যুবক আমির উদ্দিন 'কোড়া শিকারী' নামে পরিচিত। যুবকের ধৈর্য আছে বলতে হবে। কারণ পোষা কোড়া দিয়ে বুনো কোড়া শিকার বেশ কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে প্রথমে কোড়ার বাসা থেকে ডিম সংগ্রহ করে আনতে হয়। তারপর ছোট আকৃতির মাটির পাতিলে তুলো ভরে ঐ তুলোর উপর ডিম রেখে শিকারী পাতিলটিকে উপুড় করা অবস্থায়, চিকন রশি দিয়ে নিজের পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এতে করে শিকারীর দেহের উত্তাপে কোড়ার ডিম ও পাতিলের অভ্যন্তরের তুলো আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এভাবে পেটে পাতিল বাধা অবস্থায় শিকারীকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ প্রায় পঁচিশটি দিন। শুধু গোসল করার সময় কিছুক্ষণের জন্য পাতিলটি খুলে রাখতে হয়। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, শুধু পুরুষ কোড়াকেই শিকারের কাজে ব্যবহার করা হয়। কোড়ার বাসার সর্বোচ্চ আটটি পর্যন্ত ডিম দেখতে পাওয়া যায়। কিছু ডিম গোল, কিছু ডিম লম্বাটে। শিকারী ভালো দেখে লম্বা ধরনের একটি ডিম সংগ্রহ করে আনে। এই লম্বাটে ডিম থেকেই পুরুষ বাচ্চা জন্ম নিয়ে থাকে। সদ্য ডিম ফুটে বের হওয়া বাচ্চা দেখাতে কুচকুচে কালো মুরগির বাচ্চার মত। বাচ্চা বড় হয়ে ডাকতে শেখার পর, তাকে শিকারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘ সময় পর পেটে বাঁধা পাতিলে বাচ্চা ফুটলে শিকারী খুব যত্ন সহকারে বাচ্চাটিকে লালন-পালন করে বড় করে তুলতে থাকে। সুলতানপুরের আমির উদ্দিন প্রতি বছরই এভাবে বাচ্চা ফুটিয়ে শিকারী কোড়া তৈরি করে থাকে। প্রতি বছর শিকারের মৌসুম শেষে সে পোষা কোড়া বিক্রি করে দেয়। একেকটি শিকারী কোড়ার মূল্য দু'হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

শুধু কী তাই! প্রত্যেক মৌসুমে পোষা কোড়ায় সাহায্যে শিকার করা অধিকাংশ বুনো কোড়া যে টাকার লোভে বাজারে বিক্রি করে দেয়, শিকারের বিধান মতে যা খুবই অন্যায় আজ। আমির উদ্দিনের ব্যাস্ততা বেড়ে যায় মূলত বর্ষাকালে। এ সময় কোড়ায় গলার গুরুগম্ভীর ঢুব ঢুব ডাকে গ্রামের বিল-হাওর সরগরম হয়ে উঠে। তরতাজা যুবক আমির উদ্দিন তখন সব কাজ ফেলে গোড়া শিকারের জন্য পাগল হয়ে উঠে। তার বৃদ্ধা মা কিন্তু কোড়া শিকায় মোটেই পছন্দ করেন না। প্রায়ই তিনি ছেলেকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। বিশেষ করে শিকারের মৌসুমে খাঁচাবন্দী পোষা কোড়া সহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মা এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতির সুরে বলে উঠেন, 'বাবারে, আর কোড়া মারস না, তুই কি জানস না, কোড়া শিকারীরে সাপে খায়।'

মা'র এই কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমির উদ্দিন, সে এসব পাত্তাই দেয় বা। তার মতে, যে একজন শিকারী। আর শিকারীকে কখনও ভীতু হতে নেই। শিকার হচ্ছে সাহসী পুরুষের নেশা, যেখানে খেলা চলে নিজের জীবন এবং অন্যের জীবন নিয়ে। এ কাজে ঝুঁকি, শংকা, ভয় এসব থাকতেই হয়। তাই মায়ের

নিষেধ অমান্য করে প্রতিবার বুক ফুলিয়ে কোড়া শিকারে যায়। আবার শিকার করা কোড়া নিয়ে সদর্পে বাড়ি ফিরে আসে। মা কিন্তু কিছুতেই খুশি হতে পারেন না। কারণ কোড়া শিকারের ভয়ংকর দিক সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সবসময় প্রচণ্ড শংকায় আচ্ছন্ন থাকে তার মন।

কোড়া জলচর পাখি, আকারে অনেকটা মোরগের মত। স্ত্রী ও পুরুষ কোড়ার গায়ের রঙের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পুরুষ কোড়ার গায়ের রঙ কালো, স্ত্রী কোড়ার শরীর বাদামী পালকে ঢাকা। পুরুষ কোড়ায় মাথায় শিরস্ত্রাণের মত লাল একটি অংশ থাকে। কোড়ার চারিত্রিক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা লড়াকু জাতের পাখি। যে কোন বিল বা হাওরে হয়তো একাধিক জোড়া থাকতে পারে কিন্তু সব কোড়া ডাকতে পারে না। কেবল ঐ বিলের সবচেয়ে শক্তিশালী কোড়াই ঢাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোন এক বিলের মধ্যে একটি কোড়া ডাকছে, ঠিক সে সময় অন্য একটি কোড়া এসে একটু দূরে বসে ডাকতে শুরু করল। দেখা যাবে, প্রথম কোড়াটি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে নতুন কোড়াটিকে আক্রমণ করবে এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে যে কোড়া জয়ী হবে, একমাত্র সে-ই ওই এলাকায় ডাকতে পারবে। এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে যুগ যুগ ধরে কাজে লাগিয়ে আসছে আমির উদ্দিনের হত শিকারী। এরা নিজেদের পোষা কোড়াকে নিয়ে জংলী কোড়া থাকার সম্ভাব্য স্থানে ছেড়ে দেয়। পোষা জোড়া তখন আপন মনে ঢুব ঢুব শব্দে ডাকতে শুরু করে। সেই ডাকের শব্দে জংলী কোড়া দৌড়ে এসে শিকারীর পোষা কোড়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই বিচিত্র লড়াইয়ে তারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে তাদের পায়ের নখ। দ্বন্দ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে এক কোড়ার পায়ের নখের সঙ্গে অন্য কোড়ার পায়ের নখ শক্ত করে আটকে যায়। কোড়াদের পায়ের নখের এই যুদ্ধকে গ্রামের লোকেরা বলে 'চঙ্গল'। দুই কোড়া চঙ্গলে লিপ্ত হয়ে টেক টেক শব্দে ডাকতে থাকে। সেই শব্দ শুনে শিকারী বুঝতে পারে, পোষা কোড়া জংগী কোড়াকে আটকে ফেলেছে। তখন ওঁৎ পেতে থাকা শিকারী দৌড়ে গিয়ে দু'টো কোড়াকেই ধরে ফেলে। মোট কথা কোড়া শিকারের গোটা প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। কাউকে একবার কোড়া শিকারের নেশায় পেলে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে ওটা ছাড়তে পারে না।

এক বছর প্রবল বন্যায় দেশের অধিকাংশ জায়গা তলিয়ে গেল। আমির উদ্দিনের বাড়ির পাশের চরসিন্দুরের চরের বেশিরভাগ জায়গায় পানি উঠে পড়ল। পাট, আখ, আমন ধান সহ নানা জাতের ফসলে ভরা চর। মাঝখানের খেতগুলোতে আংশিক পানি উঠেছে, ডুবতে বসেছে কিনারার খেতগুলো। চর এলাকার এক কৃষক আমির উদ্দিনকে একটা সুসংবাদ এনে দিল। চরের

রাজবাড়ির পাহারাদার

রূপকথার মায়াপুরীর মত সুন্দর এক গ্রাম ঈশানপুর। সেই গ্রামের দুরন্ত এক কিশোরের নাম খোকন। এই পৃথিবীতে তার আপন বলতে তেমন কেউ নেই। সে যখন খুব ছোট, তখন এক রাতে কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল তার বাবা-মা আর বড় বোনের। এরপর কয়েক বছর ওকে লালন-পালন করে ওর এক ফুপু। একটু বড় হওয়ার পর থেকে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে ওর সময় কাটতে থাকে। এখন সে কাজ করে গ্রামের বিত্তশালী কৃষক লতিফ সরকারের বাড়িতে।

প্রতিদিন সকালে গরু নিয়ে মাঠে যায়। খোকন খুব ভালো তীর-ধনুক চালাতে পারে। গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই আশপাশের ঝোপ-জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। নানা জাতের পাখি আর বুনো খরগোশ শিকারে ওস্তাদ সে। যেদিন দু-একটা খরশোস শিকার করে বাড়িতে ফিরে আসে, সেদিন লতিফ সরকারের বাড়ির সবাই খুব খুশী হয়। কারণ খরগোশের মাংস সবার অতি প্রিয়।

একদিন একটু বেলা থাকতেই গরুগুলোকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল খোকন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে অনেক লোকের হৈ-চৈ আর চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল। বাড়িতে ঢুকতেই আসল ঘটনা জানতে পারল। সরকার সাহেবের বউ তার দেড় বছরের ছেলেটাকে বিছানায় রেখে রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। ছেলেটা ঘুমিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর কান্না সেরে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান, বিরাট এক গোখরো ফণা তুলে বসে আছে ছেলেটার ঠিক পাশে। সাপ দেখায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তার চিৎকারের শব্দে সরকার সাহেব সহ অনেকেই ছুটে আসেন। কেউ কেউ উঁকি দিয়েও ঘটনাটা দেখতে থাকে। কিন্তু কেউ এগিয়ে গিয়ে কিছু করার সাহস পেল না। সবাই বুঝে গেছে, সাপটাকে এখন কিছু করতে গেলে সেটা সাথে সাথে ছেলেটাকে ছোবল মারবে। মারাত্মক আতংকে সবাই কেমন যেন বোবা হয়ে গেল! খোকন দ্রুত ভাবতে থাকে কী করা যায়। মালিকের বিপদ মানে নিজের বিপদ। মনে মনে ঠিক করে ফেলল কী করবে। কিন্তু সে জানে, তার এই সিদ্ধান্তের কথ্য জানতে পারলে উপস্থিত সকলে তার কাজে বাধা দেবে। তাই কাউকে কিছু না বলে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে সাপটার অবস্থান ভালো করে দেখে নিল। এরপর দ্রুত কাঁধ থেকে ধনুকটা নামিয়ে সেটায় একটা তীর জুড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল।

সাপটা কিছু বুঝে উঠার আগেই সে বিদ্যুৎ গতিতে তীরটা ছুঁড়ে দিল সাপের ফণা লক্ষ্য করে। ফণায় তীরবিদ্ধ হয়ে সাপটা একপাশে পড়ে যেতেই খোকন ছুটে দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। এই ঘটনায় উপস্থিত লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সরকার সাহেব ছুটে এসে খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে খোকন সবার কাছে একজন দুঃসাহসী কিশোর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গ্রামের মানুষের যেকোন বিপদে সবার আগে ছুটে যায় সে। তীর-ধনুক নিয়ে

শিকার করার পাশাপাশি তার আরো একটি শখ হচ্ছে, নদী থেকে রাতের বেলা বড়শি দিয়ে বোয়াল মাছ ধরা। বোয়ালের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কেঁচো। রাতের বেলা সারারাত নদীর ধারে বসে থাকে। মাঝে মাঝে বিরাট সাইজের বোয়াল কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয় খোকন।

শান্ত গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুন্দর এক নদী। গ্রামের শেষ সীমানায় নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক রাজবাড়ি। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রাজবাড়িটি অনেক কালের পুরোনো। এক সময় অত্যাচারী এক রাজা শাসন করতো এই এলাকা। প্রায়ই রাজার লোকেরা গ্রামের মানুষদের ধরে নিয়ে আসত রাজবাড়িতে। ওদের নির্বিচারে হত্যা করা হতো খাজনা না দেওয়ার অজুহাতে। অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, এক সময় গ্রামের মানুষেরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ওরা সবাই একত্রিত হয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করে। রাজার সৈন্যদের হাতে অনেক গ্রামবাসী নিহত হয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর, জয় লাভ করে গ্রামবাসীরা। এরপর বিজয়ী জনতা রাজা সহ রাজ পরিবারের সবাইকে রাজবাড়িতে জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। তারপর কেটে গেছে বহু যুগ। কালের সাক্ষী হয়ে আছে রাজবাড়িটি। লোকে বহুকাল ধরে এই রাজবাড়িটিকে এড়িয়ে চলে। রাতের বেলা মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক আলো দেখা যায় এখানে! অনেকে মনে করেন ভূত-প্রেতের আস্তানায় পরিণত হয়েছে রাজবাড়িটি। রাতের বেলা তো দূরের কথা, দিনেও কেউ রাজবাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে সাহস পায় না। খোকন কিন্তু এসবে ভয় পায় না। সে প্রায়ই রাজবাড়ির ভিতয়ে যায়। পুরোনো দালানগুলোর ফাঁক-ফোকরে বাসা ঘানিয়েছে অসংখ্য বুনো পায়রা। বুনো পায়রার বাচ্চার মাংস খোকনের খুব প্রিয়। কাঠবেড়ালীর মত দালানের বিভিন্ন অংশে উঠে পায়রার বাচ্চা সংগ্রহ করে সে।

একদিন তেমনি বুনো পায়রার বাচ্চা সংগ্রহের জন্য রাজবাড়ির ভিতর ঢুকল সে। তারপর আনমনে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলো রাজবাড়ির নদীর ঘাটে। কী সুন্দর বাঁধানো ঘাট! খোকন এরপর বসে পড়ল নদীর ঘাটে। বসে থাকতে থাকতে ভাবল, অনেকদিন ধরেই সে রাজবাড়িতে আসে, কিন্তু এই সুন্দর জায়গাটায় একবারও আসা হয়নি। এসব যখন ভাবছিল, তখন বিরাট সাইজের এক বোয়াল লাফিয়ে উঠল পানির উপর; পরক্ষণেই আবার তলিয়ে গেল জলের অতনে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, আরো কয়েকটা মাছের লাফালাফি চোখে পড়ল তার। খোকন খুব সহজেই বুঝতে পারল, এদিকে মানুষ মাছ ধরতে আসে না, তাই জায়গাটা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। রাতের বেলা এখানে বড়শি নিয়ে বসে থাকলে, বিরাট সাইজের মাছ ধরা যাবে। মাছ শিকারের ভাবনায় খোকনের মাথা থেকে বুনো পায়রার বাচ্চা সংগ্রহের চিন্তা হারিয়ে গেল। মাছের চিন্তায় সে এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে, নিজ দায়িত্বের কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। হঠাৎ করে মনে পড়ল গরুগুলোর কথা, ওগুলো এখনো মাঠে আছে আর এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। নদীর ঘাট থেকে উঠে সে দ্রুত হেঁটে চলল মাঠের

দিকে। সেদিন বাড়িতে ফিরে লতিফ সরকার সহ অনেককে মাছগুলোর কথা খুলে বলল। সবাইকে এ-ও জানাল, আগামীকাল রাতে রাজবাড়ির ঘাটে বসে মাছ ধরবে। খোকনের কথা শুনে সবাই রীতিমত ভয় পেয়ে গেল, প্রত্যেকেই ওকে রাতের বেলা রাজবাড়ির দিকে যেতে নিষেধ করল। এ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, 'ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে'। কেউ বলল, 'বাপ-মা মরা ছেলে এমনি ত্যাঁদড় হয়'। আবার কেউ বলল, 'আসলে মৃত্যু ছেলেটাকে ডাকছে'।

পরদিন ভোরে ভাত খেয়ে গরুগুলোকে নিয়ে খোকন হেঁটে চলল মাঠের দিকে। আজকে সে তীর-ধনুক সাথে নেয়নি। সঙ্গে নিয়েছে একটি কোদাল ও ছোট্ট একটি টিনের কৌটা। মাঠে পৌঁছাতেই অন্যান্য রাখাল বালকরা তাকে ঘিরে ধরল। তারা জানতে চাইল, সত্যিই কি সে রাতের বেলা রাজবাড়ির নদীর ঘাটে মাছ ধরতে যাবে কি না। খোকন তাদের জানাল যে, আজকে রাতেই সারারাত সে রাজবাড়ির খাটে বসে মাছ ধরবে। তখন রাখাল বালকরা রাজবাড়ির নদীর ঘাট সম্পর্কে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর ঘটনা বলতে লাগল। একবার এক সাহসী যুবক সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাতের বেলা রাজবাড়ির ঘাটে বসে মাছ ধরতে গিয়েছিল, পরদিন সকালে সেই যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেল রাজবাড়ির উঠানে। আরেকবার তেমনি সাহসী এক লোক রাজবাড়ির ঘাটে মাছ ধরতে গিয়েছিল, পরদিন তাকেও পড়ে থাকতে দেখা গেল রাজবাড়ির উঠানে। সে অজ্ঞান হয়েছিল, জ্ঞান ফেরার পর দেখা গেল লোকটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে; গ্রামের কোন লোককেই সে চিনতে পারলো না।

রাখাল বালকেরা এমনি আরো ভয়ঙ্কর সব গল্প শোনাতে

এলসা আমার এলসা

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকের কথা। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার কামড়া মাসুক গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কয়েকটা মেছোবাঘের অত্যাচারে। মেছোবাঘের অত্যাচার এলাকার মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়। প্রতি বছর শীতকালে গজারি বনের ভিতরের ঝোপ-জঙ্গলগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় গজারি বনে বসবাসকারী বন্যপ্রাণীদের মারাত্মকভাবে আত্মগোপনে থাকার স্থানের সমস্যা দেখা দেয়। মেছোবাঘ, বনবিড়াল, শজারু আর খরগোশে গজারি বন থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

বেশিরভাগই আশ্রয় নেয় আশেপাশের গ্রামের আনারস বাগানগুলোতে। বর্ষার আগ পর্যন্ত তারা অবস্থান করে বিভিন্ন আনারস বাগানে। বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজারি বনের ঝোপ-জঙ্গলগুলো দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। তখন এসব বন্যপ্রাণীরা আবার ফিরে যেতে শুরু করে তাদের স্থায়ী আবাসস্থলে অর্থাৎ গজারি বনে। কামড়া মাসুক গ্রাম গজারি বনের খুব কাছে। গ্রামের চারদিকে রয়েছে বড় বড় আনারস বাগান। তাই প্রতিবছরই গজারি বন থেকে নেমে আসা বন্যপ্রাণীদের উৎপাত সহ্য করতে হয় গ্রামবাসীদের। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে মেছোবাঘ। যখন-তখন ধরে নিয়ে যায় পোষা ছাগল-ভেড়া। কিন্তু এবারের মত এতো প্রবলভাবে আগে কখনও গ্রামবাসীরা মেছোবাঘের আক্রমণের শিকার হয়নি। একদিনে হুট করে উধাও হয়ে গেল দু'টি ছাগল। দু'একদিন পর পর ছাগল-ভেড়া ধরে নিয়ে যেতে লাগল মেছোবাঘ। তাদের হাতে আহত হলো বেশ কয়েকটা ছাগল। যাদের ছাগল-ভেড়া ছিল, সবাই হুঁশিয়ার হয়ে গেল। ফলে, মেছোবাঘগুলোর শিকার করা কষ্টকর হয়ে গেল। এবার ওদের দৃষ্টি পড়ল পোষা হাঁস-মুরগীর দিকে। একসময় যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে মিটিং-এ বসল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল আনারস বাগানগুলো ঝাড়া (এসব অঞ্চলে জঙ্গল বিট দেয়াকে স্থানীয় ভাষায় 'ঝাড়া' বলে) নিয়ে মেছোবাঘগুলোকে মেরে ফেলতে হবে।

বাগান ঝাড়া দিতে হলে দরকার লম্বা একটা জাল। কিন্তু এ ধরনের জাল বর্তমানে কারও কাছে নেই। গ্রামের অবস্থাশালী কৃষক আব্বাস আলীর ছেলে আলাউদ্দিন জাল তৈরির দায়িত্ব নিল। গ্রামবাসীদেরকে জানাল, সবাই তার সঙ্গে সহযোগিতা করলে দুই দিনের মধ্যে সে জাল তৈরি করে ফেলবে। শুধু জাল তৈরি নয়, মেছোবাঘ শিকারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো আলাউদ্দিনকে। মোটা সুতা জোগাড় করে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আলাউদ্দিন দেড়শো হাত দৈর্ঘ্য এবং চার হাত প্রস্থের একটা বিশাল লম্বা জাল তৈরি করে ফেলে। জালের প্রতিটি ফাঁক ছিল চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্য-প্রস্থের। এরমধ্যেও কিন্তু মেছোবাঘগুলো থেমে নেই। একটা ছাগল আর কয়েকটা হাঁস-মুরগী মারা পড়ে ওদের হাতে। আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা দ্রুত নেমে পড়ে মেছোবাঘ শিকারে। একটা একটা করে বাহান ঝাড়া দেওয়া শুরু করে। ঝাড়া দেওয়ার আগে, আলাউদ্দিন

নিজস্ব কৌশলে কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আনারস বাগানের যেকোন দুই দিক থেকে বল্লম আর তীর-ধনুক হাতে হৈ-চৈ করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমদিন গ্রামবাসীদের ধাওয়ার মুখে পালাতে গিয়ে জালে আটকে পড়ে একটা বাঘ। আলাউদ্দিন সবার আগে ছুটে গিয়ে বল্লমের ফলা চেপে ধরেছিল বাঘটার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রামবাসী এগিয়ে এসে আঘাত করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয় বাঘটার! পরেরদিনও চলে একটা পর একটার বাগান ঝাড়া দেওয়া। দুপুরের দিকে জালে আটকে পড়া আরেকটা বাঘকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয় গ্রামবাসীরা। এই বাঘটার দেহের প্রথম আঘাত করেছিল আলাউদ্দিন। শিকারের অলিখিত আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে শিকারী শিকারের দেহে আগে আঘাত করতে পারবে, সমস্ত শিকারের কৃতিত্বের দাবিদার হবে একমাত্র সেই শিকারী।

গ্রামবাসীদের অনেকেই শিকারের নিয়মটা জানে। তাই সবাই আলাউদ্দিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। দুইটা মেছোবাঘ মারা পড়ল দুইদিনে। তৃতীয় দিনে, অনেকগুলো বাগান ঝাড়া দিয়েও কোন বাঘের দেখা পাওয়া গেল না। গ্রামের বেশিরভাগ বড় বড় বাগানই ঝাড়া দেওয়া হয়ে গেল। তৃতীয় দিন দুপুরের পরে ছোট একটা বাগান ঝাড়া দেওয়ার সময় গ্রামবাসীরা দেখতে পায় আরেকটা মেছোবাঘকে। বাঘটা জালের দিকে না গিয়ে সোজা রুখে দাঁড়ায় গ্রামবাসীদের দিকে। একজন একটা বল্লম ছুঁড়ে দেয় বাঘটার পেট লক্ষ্য করে। বল্লমটা আঘাতও করে ঠিক জায়গামত। বাঘটা পেটে বল্লম নিয়েই এগিয়ে আসে সামনের দিকে। মেছোবাঘের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে পিছু হটে যায় অনেক গ্রামবাসী। সামনের দিকে এগিয়ে আসায় পেট থেকে খুলে যায় বল্লমের ফলাটা আর পেটের ঐ ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে বাঘের নাড়িভুঁড়ি। গ্রামবাসীরা এবার বুঝতে পারে, অচল হয়ে গেছে বাঘ। একের পর এক ছুটে আসা বল্লমের আঘাতে মৃত্যু হয় বাঘটার। আলিমুদ্দিন সহ সবাই ভাবতে থাকে বাঘটা জালের দিকে পালিয়ে না গিয়ে কেন রুখে দাঁড়াল এবং কেন বোকার মত যুদ্ধ করতে গেল এতগুলো বল্লমধারী মানুষের সঙ্গে? গ্রামবাসীরা একে অপরকে প্রশ্ন করতে লাগল। গ্রামবাসীদের সবার প্রশ্নের উত্তর দিলেন আলাউদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা আব্বাস উদ্দিন।

তিনি বললেন, "এটা বাঘিনী এবং খুব কাছেই এর বাচ্চা আছে। তাই ও এমন বেপরোয়া আচরণ করেছে।" এগিয়ে গিয়ে মৃত বাঘিনীর দেহকে চিৎ করে বললেন তিনি। এরপর গ্রামবাসীরা যা দেখলো, তাতে নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। দুধের ভারে ফুলে আছে বাঘিনীর প্রত্যেকটা স্তন। স্তনের বোঁটাগুলো ভেজা ভেজা। এই দৃশ্য দেখলে একটা দুই বছরের বাচ্চাও বুঝে ফেলবে, বাচ্চা আছে বাঘিনীর আর একটু আগেও বাচ্চাদের দুধ খাইয়েছে। পেটের ফাঁক নিয়ে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি আর ফুলে উঠা স্তনের ভেজা বোঁটাগুলো যেন কি একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে প্রতিটি গ্রামবাসীর মুখের দিকে। নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল প্রত্যেকে। অন্ধকারের মত ম্লান হয়ে গেল তাদের শিকারের আনন্দ। বিস্ময়ের ঘোর

কেটে উঠার পর, গ্রামবাসীরা বাঘিনীর বাচ্চাগুলোকে খুঁজতে লাগল। বাঘিনীর মৃতদেহ থেকে একটু দূরেই পাওয়া গেল তিনটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাকে। আনারস গাছের নিচে চুপ করে বসে আছে ওরা। সবেমাত্র চোখ ফুটেছে সুন্দর বাচ্চাগুলোর। তুলতুলে বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীরা রওনা হয়ে যায় আলাউদ্দিনের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আলাউদ্দিনের বাড়িতে মেছোবাঘের বাচ্চা তিনটি তিনদিন ছিল। খবর পেয়ে বহুদূর থেকে মানুষ এসেছে মেছোবাঘের বাচ্চা দেখতে, সাংবাদিকরা এসে ছবি তুলে নিয়ে গেছে পত্রিকায় ছাপানোর জন্য। সবশেষে আসে পুলিশের দল। তারা এসে বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে যায় থানায়। তারপর সেখান থেকে বাচ্চাগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকা চিড়িয়াখানায়।

মেছোবাঘের একটা বাচ্চা পোষার বহুদিনের শখ ছিল আমার। ভাওয়ালের গজারি বনগুলোর আশেপাশের এলাকায় প্রতি বছর শীতকালে মেছোবাঘের বাচ্চা ধরা পড়ে মানুষের হাতে, এটা আমি ভালো করেই জানতাম। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। যেমন করেই হোক একটা মেছোবাঘের বাচ্চা সংগ্রহ করে আমি সেটাকে বড় করে তুলব— এমন একটা চিন্তা ছিল আমার। কামড়া মাসুক গ্রামে মেছোবাঘের বাচ্চা ধরা পড়ার খবরটা আমার কাছে আসে অনেক দেরিতে। তবুও আমি ছুটে যাই আলাউদ্দিনের বাড়িতে। আলাপ পরিচয় করি সুঠামদেহী বুদ্ধিমান যুবকটির সঙ্গে। নিজের শিকার করা মেছোবাঘগুলোর চামড়া আর মাথাগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছে সে। এক এক করে সে আমায় শিকারের সরঞ্জামগুলো দেখাল। সুন্দর সুন্দর তীর-ধনুক, সুন্দরী কাঠের হাতওয়ালা বল্লম আর মেছোবাঘ শিকারের জন্য তৈরি দেড়শো হাত লম্বা জাল— সব দেখলাম। মেছোবাঘের বাচ্চার প্রসঙ্গ উঠতেই তার মুখটা কালো হয়ে গেল। সে আমাকে বলল, ঘুণাক্ষরেও যদি সে জানতো বাঘিনীটার বাচ্চা আছে, তাহলে কিছুতেই সে গ্রামবাসীদেরকে বাঘিনীটাকে মারতে দিত না। আসলে যদি গ্রামবাসীরাও বাঘিনীর বাচ্চাগুলো সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারাও কখনো বাঘিনীটাকে মারত না। গোটা ব্যাপারটাই একটা দুর্ঘটনা। খুবই দুঃখজনক দুর্ঘটনা। মেছোবাঘের বাচ্চাগুলোকে পুলিশ গেছে, এজন্য তার মোটেও কোন দুঃখ নেই। বরং সে খুশি। বাচ্চাগুলো বরং তার কাছে থাকলে ওদের সঠিক পরিচর্যা করতে পারত না। সে মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করে, বাচ্চাগুলো যাতে চিড়িয়াখানায় সুন্দর ও সুস্থভাবে বড় হয়।

শিকারীদের ব্যাপারে অনেকের মনে একটা খুবই ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধে আছে। সবাই ভাবে, শিকারী মাত্রই কঠিন মনের অধিকারী এবং নিষ্ঠুরভাবে তারা বন্যপ্রাণী হত্যা করে। কথাটা ভুল। যেহেতু আমি একজন শিকারী